প্রবন্ধাবলি, *খণ্ড : ১২*, *জুলাই ২০২০*, ৯-২৬

হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিবর্তন: একটি নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

(Traditional Political System and Its Transformation in the Hijra Community: An Anthropological Analysis)

ড. মো. ফারুক শাহ[১]
ফাল্গুনী হালদার[২]

সারসংক্ষেপ

হিজড়া জনগোষ্ঠী বৃহত্তর সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তার পরিবর্তন সম্পর্কে তুলে ধরাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। গবেষণাটি মূলত গুণগত প্রকৃতির। তবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে বর্তমান গবেষণাকর্মটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎসের উপাত্তের সমন্বয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী, একজন শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে হিজড়াদের ন্যায় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হলে সেই হিজড়া শিশুটির প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। ফলে শিশুটি পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে একজন গুরুমায়ের (হিজড়া জনগোষ্ঠীর পরিবার প্রধান) অধীনে হিজড়া সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় ও বসবাস শুরু করেন। সেই স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা মূলত দারাজনী, গুরুমা ও শিষ্য/চ্যালার সমন্বয়ে গঠিত। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'দারাজনী' হলেন সকলের প্রধান এবং 'গুরুমা' হলেন শিষ্যদের প্রধান। অর্থাৎ গুরুমা হলেন শিষ্য হিজড়াদের প্রথাগত রাজনৈতিক অভিভাবক। শিষ্যরা মূলত গুরুমাকে অভিভাবক/পিতৃতুল্য/মাতৃতুল্য হিসেবে মান্য করে থাকেন। হিজড়া সমাজে তিনিই মূলত সকল সমস্যা দেখাশোনা করেন। তবে গুরুমা ও শিষ্যর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও অনেক সময় তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। শিষ্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে গুরুমা নিজেই সমাধান করেন। কিন্তু তা জটিল হলে দারাজনী তাঁর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরসন করেন। তবে বর্তমানে তাঁদের হিজড়া লিঙ্গের স্বীকৃতি পাওয়ায় তাঁরা প্রথাগত রাজনীতির পরিবর্তন ও বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এই স্বীকৃতির ফলে তাঁরা ভোটাধিকার, জাতীয় পরিচয়পত্র, ভোটার তালিকায় হিজড়া লিঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বৃহত্তর রাজনীতিতে তাঁদের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনসহ স্থানীয়

[১] সহযোগী অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ইমেইল: faruk@du.ac.bd
[২] ফ্রিল্যান্স গবেষক ও গ্রাজুয়েট, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ইমেইল: rufalguni68@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.59146/PBDHV12A1

সরকার নির্বাচনে তাঁরা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। এতে বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তাঁদের সখ্য সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে এবং তাঁরা তাদের নিকট থেকে পেশাগত সুবিধাও গ্রহণ করছেন। তবে পুরোপুরি রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত এবং পিতা-মাতার সম্পত্তিতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে হিজড়াদের নাগরিক ও সামজিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

মূল শব্দ: হিজড়া জনগোষ্ঠী, প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা, হিজড়া লিঙ্গের স্বীকৃতি, ক্ষমতায়ন।

Abstract: The Hijra community is an integral part of wider society as a whole. The objective of this article is to illustrate the community's traditional political system and its transformation. In line with the aims, this study has been conducted by incorporating data from both primary and secondary sources. According to the findings, family and social attitudes towards hijra children change as a child grows and develops characteristics similar to those of hijras. Consequently, the child leaves the family, becomes a member of the hijra society under a *Guruma* (head of the family of the hijra community), and starts living. The distinct feature of the society is the traditional political system, consisting mainly of *Darajni, Guruma* and *Chela*. In this political structure, '*Darajni*' is the ultimate leader, while '*guruma'* remains in charge of *chela*. When there is dispute among the followers, *guruma* settles it by herself. But if it is complicated, *darajni* solves it through the Panchayat system. Now that their gender identity is recognized, they are interested in altering traditional politics, and willing to participate in the greater political system. Moreover, as a result of this recognition, their right to vote, national identity card, and inclusion as 'hijra gender' in the voter list have expanded their scope for participation in greater politics. Many issues of the community may be solved if their political rights are fully ensured and their rights to their parents' property are recognized.

প্রেক্ষাপট

হিজড়া জনগোষ্ঠী এদেশের প্রান্তিক, অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের মধ্যে অন্যতম। এই জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পরিভাষায় ও নামে পরিচিত হলেও বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান তথা এই উপমহাদেশে সাধারণত 'হিজড়া' হিসেবে পরিচিত (Sharma, 2012)। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও এই জনগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। তবে হিজড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন। এমনকি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর

সদস্যরা যেভাবে আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত, হিজড়া জনগোষ্ঠীর সদস্যরা সেভাবে গতানুগতিক রাজনীতির সাথে জড়িত নয়। বিধায় পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে পৈত্রিক সম্পত্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেশা, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য অধিকারসহ নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন ও মানবেতর জীবনযাপন করছে (মজুমদার, ২০০৭)। অর্থাৎ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বাইরে গিয়ে হিজড়া সদস্যরা নিজেদের মধ্যে স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করেছে। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায়, হিজড়া জনগোষ্ঠীর নতুন পরিচিতির স্বীকৃতি এই জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে।

রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানীদের মতে, মানব সমাজের শুরু থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ব্যান্ড, ট্রাইব, চিফডম এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা। অর্থাৎ মানব সমাজের শুরুতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা না থাকলেও সমাজের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন এবং জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব প্রদানের রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। সময়ের পরিবর্তনে অনানুষ্ঠানিক থেকে আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে (Haviland, 1990)। তবে আধুনিক সমাজে এমন কিছু জনগোষ্ঠী দেখা যায় যারা এখনও প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ও লালন-পালনকারী। এরকম প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধিকারী হিজড়া জনগোষ্ঠী যারা সমাজের দ্বন্দ্ব সংঘাতসহ সকল বিষয় মূলত নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করে থাকে। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা মূলত গুরুমা ও শিষ্য বা চ্যালা কেন্দ্রিক। হিজড়া জনগোষ্ঠীর গুরুমা নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাঁদের জীবন ও জীবিকার প্রধান চালিকা শক্তি। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে তাঁদের আর্থ-সামজিক অবস্থা। গুরুমা হলেন হিজড়া পরিবারের প্রধান ও প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূখ্য নিয়ন্ত্রক। ফলে সাধারণ শিষ্য হিজড়ারা গুরুমার নিকট দায়বদ্ধ। প্রথা অনুযায়ী গুরুমা যেমন সাধারণ শিষ্যদের সকল বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন তেমনি তাঁর দ্বারা শিষ্যরা অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হয়ে থাকেন (Nanda, 1999)। তবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে 'হিজড়া লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে তাদের প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তাই এই জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা নিবিড়ভাবে জানতে হলে বা জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন সাধন করতে হলে তাঁদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করা। অর্থাৎ গুরুমা ও শিষ্যের সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাত্রা তুলে ধরা। অতএব, নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী এ গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশের অবহেলিত, প্রান্তিক ও অনগ্রসর এই জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক বিষয়ে আলোকপাত করবে যা জ্ঞানকান্ডের এই শাখায় নতুন তথ্যের সংযোজন করবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিজড়া বসবাস করে। তবে তারা জীবন ও জীবিকার প্রতিটি স্তরেই বৈষম্য, অবহেলা ও বিভিন্ন ধরনের জটিলতার শিকার। তথাপি তাদের জীবন বিশেষকরে রাজনৈতিক

ব্যবস্থা সম্পর্কে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা বাংলাদেশে অপ্রতুল। Hassan (২০২০) এর মতে, রাজনৈতিক অধিকারের অংশ হিসেবে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে হিজড়া লিঙ্গের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু এই জনগোষ্ঠী রাষ্ট্র ও সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেহেতু রাষ্ট্রের কাঠামোতে প্রদত্ত বা আরোপিত সকল নাগরিক অধিকার ও স্বীকৃতি তাঁদের প্রাপ্য। হিজড়া জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অধিকার ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। Daize ও Masnun (2019) ঢাকা শহরে বসবাসরত হিজড়া জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত গবেষণাকর্মে দেখতে পান, বর্তমানে হিজড়ারা রাজনৈতিক প্রতিনিধি নির্বাচনে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। তারা সবাই মোটামুটি রাজনীতি সচেতন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ২৪ শতাংশ হিজড়া দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে জড়িত। তাছাড়া ২২ শতাংশ হিজড়া তাঁদের ইচ্ছামত পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদান করেন। ৬২ শতাংশ হিজড়ারা গুরুমায়ের প্রভাবে গুরুমার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদান করে থাকেন এবং ১৬ শতাংশ রাজনৈতিক নেতা বা অন্যান্যদের চাপের মুখে তাদের নির্ধারিত প্রার্থীকে ভোট প্রদান করতে বাধ্য হন। গবেষকদ্বয় হিজড়াদের ভোটাধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করলেও প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধরণ ও পরিবর্তন সম্পর্কে নিবিড় বর্ণনা প্রদান করেননি। অন্যদিকে Khanam (২০২১) এর মতে, সমাজের অন্যান্য নাগরিকের ন্যায় হিজড়াদেরও স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের কারণে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একইভাবে Hossain (2021) বাংলাদেশের ঢাকা শহরের হিজড়া জনগোষ্ঠীর অনুভূতি ও ক্ষমতা এথনোগ্রাফিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখান যে, হিজড়াদের সামাজিক শ্রেণী মূলত বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থা কর্তৃক নির্মিত যা অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সাথে তাদের প্রাত্যহিক আন্তঃসম্পর্কের মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

বাংলাদেশে হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা না থাকলেও ভারতীয় হিজড়াদের নিয়ে বেশ কিছু সমাজতাত্ত্বিক ও নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে, যেমন- Reddy (2005) হায়দ্রাবাদের হিজড়াদের প্রথাগত রাজনীতি, পরিচিতি ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, হিজড়াদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুমা শিষ্যদের মা-বাবা হিসেবে স্বীকৃত। এক্ষেত্রে উভয়ের রয়েছে পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। গুরুমার দায়িত্ব হলো নতুন শিষ্যকে বাসস্থান, খাদ্য, নিরাপত্তা এবং জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা। তবে গুরুমা ও চ্যালার পারস্পারিক সম্পর্কের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে Nanda (1999) হিজড়াদের সামাজিক সংগঠন, অর্থনৈতিক অভিযোজন ও গুরুমা-চ্যালার পারস্পারিক সম্পর্ক তথা প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। শিষ্যরা রাজনৈতিকভাবে গুরুমার সাথে সংশ্লিষ্ট ও অনেকাংশে নির্ভরশীল। Nanda ভারতীয় সমাজে হিজড়া জনগোষ্ঠীর পারিবারিক প্রেক্ষাপট, গুরুমা ও চ্যালার পারস্পারিক সম্পর্ক, সামাজিক সংগঠন ও অর্থনৈতিক অভিযোজন সম্পর্কে আলোচনা করলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করেননি। তবে ভারতীয় হিজড়াদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা প্রদান করেন মজুমদার ও বসু (১৯৯৭)। তাঁদের মতে, "গুরু-মায়ের সেবা যত্ন করা সাধারণ শিষ্যদের একটি বড় কাজ। ওপর-ওপর মা-মেয়ের সম্পর্ক আরোপিত হলেও, গুরু-মায়েরা ছোটখাটো জমিদার। শিষ্যরা হলো তার প্রজা বা অনুগত ভৃত্য। গুরুকে তুষ্ট করার ব্যাপারে সাধারণ

শিষ্যরা সবসময় সচেতন থাকে। গুরু-মায়ের মর্জি মাফিক তাদের চলতে হয়। গুরুর নির্দেশ অমান্য করা মানেই শাস্তি পাওয়া" (পৃ-৫৬)। তাই বর্তমান গবেষণায় গুরুমা-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো, কার্যাবলী ও সাম্প্রতিক পরিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়াবলী নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ করা। এই লক্ষ্যকে বিবেচনায় রেখে প্রবন্ধের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

- হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা;
- গুরুমা ও শিষ্যের মধ্যকার সম্পর্ক, গুরুমায়ের যোগ্যতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা করা;
- হিজড়াদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব সমাধানের নিমিত্তে প্রচলিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা; এবং
- হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনে হিজড়া লিঙ্গের স্বীকৃতির প্রভাব তুলে ধরা।

গবেষণা পদ্ধতি

হিজড়া জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিবর্তন তুলে ধরা এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে গবেষণাকর্মটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎসের উপাত্তের সমন্বয়ে সম্পাদন করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার হিলি এলাকার হিজড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে মাঠকর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠকর্মের জন্য হিলি এলাকা নির্বাচনের মূল কারণ হচ্ছে এখানে সবসময় প্রায় ১০০ জনের বেশি হিজড়া সদস্যদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ এই এলাকায় অধিকসংখ্যক হিজড়াদের একসঙ্গে বসবাস করার প্রবণতা রয়েছে। গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একই সময়ে এত সংখ্যক হিজড়াদের বসবাস সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। বিধায় হিজড়াদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহের জন্য এটি একটি উপযুক্ত গবেষণা স্থান। স্থানীয় একজন কলেজ শিক্ষক বর্তমান গবেষণা দলের পূর্ব পরিচিত যিনি স্থানীয় হিজড়াদের গুরুমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। গুরুমা গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তথ্য ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে গবেষণার জন্য তথ্য প্রদান করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং তার অধিনস্থ সকল হিজড়া শিষ্যদের এই বিষয়ে সহায়তার জন্য উপদেশ দেন। পরবর্তীতে গবেষকদ্বয় তথ্যদাতাদের সম্মতি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। মাঠকর্মে তথ্য সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত ২০টি নিবিড় সাক্ষাৎকারে গ্রহণ করা হয়েছে। ২০ টি নিবিড় সাক্ষাৎকারের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ০২ জন গুরুমা, ০৬ জন মালকিন ও ১২ জন শিষ্য বা চ্যালার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের কিছু বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নেওয়া হয় যেমন- বয়োজ্যেষ্ঠতা, দীর্ঘদিন ধরে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা। এছাড়া ০২ টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ০৫ টি ঘটনা পঠন এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য

সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে শুধুমাত্র শিষ্যদের এবং অন্যটিতে মালকিনদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সমজাতীয় দলকে তথা 'শিষ্য' ও 'মালকিন' দের নির্বাচন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ঘটনা পঠনের মাধ্যমে ০১ জন দারাজনীর যোগ্যতা, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশদ তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ০১ জন গুরুমার দায়িত্ব-কর্তব্য তথা নিজ গোষ্ঠীকে নেতৃত্বদানের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি ০৩ জন চ্যালার ঘটনা পঠনের মাধ্যমে হিজড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, সালিশ ও সমাধান নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তথ্যদাতাদের অধিকাংশই নিম্ন আয়ের। কিছু অংশ নিজেদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে করে। তারা মূলত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ও সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারনে হিলি এলাকায় বসবাস করছে। এখানে শ্রমিক, যৌনকর্মী, বাচ্চা নাচানো ও চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করে।

এছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও পত্র-পত্রিকায় হিজড়া জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্যকে মাধ্যমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যসমূহ গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ দৃষ্টিভঙ্গি (thematic analysis approach) ব্যবহার করে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তথ্য বিশ্লেষণ ছয় ধাপে সম্পন্ন করা হয়েছে: সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ট্রান্সক্রিপ্ট, প্রারম্ভিক সংকেতায়ন, থিম অনুসন্ধান, থিমের পর্যালোচনা, থিমের নামকরণ এবং সর্বশেষে প্রবন্ধ প্রস্তুত করা হয়েছে। ঘটনা পঠন ও নিবিড় সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে প্রাপ্ত তথ্যের যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাপ্ত তথ্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে। অর্থাৎ তথ্যের নিশ্চয়তা এবং নির্ভরতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ত্রিমাত্রিক (triangulation) তুলনা করা হয়েছে। গবেষণার নৈতিকতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তথ্যদাতাদের সম্মতি গ্রহণ এবং ছদ্মনাম ও গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক সংগঠন

যেকোন জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কেননা মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সমাজের শৃংখলা যেমন বজায় রাখা হয় তেমনি বিশৃংখলাও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। Haviland (1990) এর মতে, "political organization is the system of social relationships that provides for the coordination and regulation of behaviour, insofar as that behaviour is related to the maintenance of public order" (p. 322). পক্ষান্তরে Fried (1967) বলেন, "political organization comprises those portions of social organization that specifically relate to the individuals or groups that manage the affairs of public policy or seek to control the appointment or activities of those individuals or groups" (pp. 20-21). অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগঠন হচ্ছে একটি সমাজের আইন-শৃংখলা ও নীতির বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। এমন সংগঠন হতে পারে বিকেন্দ্রীকরণ ও অনানুষ্ঠানিক অথবা কেন্দ্রীভূত ও আনুষ্ঠানিক (Kottak, 2015). Haviland (1990) যুক্তি দেখান, সকল সমাজে আনুষ্ঠানিক আইন ও বিচারব্যবস্থা না থাকলেও সমাজের

শৃংখলা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের রীতি-নীতি ও উপায় রয়েছে। একইভাবে Ember and Ember (1993) বলেন,"...all societies have political activities and beliefs that are ways of creating and maintaining social order and coping with social disorder" (p. 368) । Service (1962) প্রত্নতাত্ত্বিক ও এথনোগ্রাফিক তথ্যের আলোকে দেখান, মানব ইতিহাসে এখন পর্যন্ত চার ধরণের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, যথা: 'Band', 'Tribe', 'Chiefdom' ও 'State'. আধুনিক সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকলেও পূর্বে মূলত উল্লেখিত প্রথম তিন ধরণের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। বর্তমান প্রবন্ধে প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে হিজড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সামাজিক শৃংখলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার নিমিত্তে চর্চিত রীতিনীতি, প্রথা ও কর্মকান্ডকে নির্দেশ করা হয়েছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা

হিজড়া জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ব্যবস্থা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর থেকে ভিন্ন। এই স্বতন্ত্র প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা দারাজনী, গুরুমা, মালকিন ও শিষ্য নিয়ে গঠিত। দারাজনী হলেন গুরুমাদের প্রধান। দারাজনী হিজড়াদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সোপান হলেও গুরুমাই মূলত শিষ্যদের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই নিজস্ব এলাকায় গুরুমা-ই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর গতানুগতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেমন নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক রাজনৈতিক নেতা নিযুক্ত থাকেন, তেমন হিজড়াদের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক গুরুমা নিয়োজিত থাকেন। বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেমন উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক নেতাদের দেখভাল বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জেলা বা বিভাগ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ নিযুক্ত থাকেন, তেমন নির্দিষ্ট এলাকায় নিযুক্ত গুরুমাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁদের উপরে দারাজনী থাকেন। একটি নির্বাচিত রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, পেশা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসহ সামগ্রিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তেমনি গুরুমা তাঁর অধীনস্থ সকল হিজড়াদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, পেশা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসহ সকল বিষয়ের দেখভাল করে থাকেন। Nanda (1999: 43) এর মতে,

> Seniority, as the major principle of social organization and social control in the hijra community, is expressed in a hierachy of gurus (literally, teacher) and chelas (literally, disciples). Every hijra has a guru, and initiation into the community occurs only under the sponsorship of a guru.

তাই হিজড়া জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র এই সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুমা-ই শিষ্যদের সকল বিষয়ের যোগান নিশ্চিত করেন এবং সমুদয় বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে তাদের জীবন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করেন। ফলে সকল হিজড়া গুরুমার অধীনস্থ হয়ে একধরনের আত্মিক বা জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এই ব্যবস্থা হিজড়া সমাজে 'প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। হিজড়াদের এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাসহ সামগ্রিক জীবন একজন গুরুমা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং গুরুমাই সকল ক্ষেত্রে মূল নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন (মজুমদার ও বসু, ১৯৯৭)। ফলে একজন গুরুমা'র অধীনে বেশ কয়েকজন হিজড়া সদস্য থাকেন, যারা 'শিষ্য' নামে পরিচিত (Mal, 2018)। তাই হিজড়াদের মধ্যে স্তরবিন্যাসের প্রথাগত রাজনীতি বিরাজমান। এই প্রথা অনুযায়ী গুরুমা সর্বোচ্চ

ক্ষমতার অধিকারী। বিধায়, সবাই তাঁর সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে চেষ্টা করেন কেননা সুসম্পর্কের বিনিময়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।

হিজড়াদের স্তরায়নে চ্যালা থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, হিজড়াদের সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'চ্যালা' হলো হিজড়াদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন স্তর, মালকিনের রাজনৈতিক অবস্থান চ্যালার উপরে এবং গুরুমার নিচে। মালকিনরা মূলত গুরুমায়ের মেয়ে হিসেবে পরিচিত। আর 'গুরুমা' হলেন মালকিন ও চ্যালাদের প্রধান এবং দারাজনী হলেন সর্বোচ্চ স্তর, যিনি গুরুমারও গুরুমা। গুরুমা নির্দিষ্ট এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় সকল চ্যালাই গুরুমার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখেন যেন তিনিও পরবর্তীতে গুরুমার আশীর্বাদে গুরুমা হতে পারেন। কেননা হিজড়া সমাজে গুরুমার আশীর্বাদই চ্যালার ভাগ্য পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ামক। এ প্রসঙ্গে মনিরা (৩৫) বলেন,

> গতানুগতিক রাজনীতির সাথে আমাদের বেশি সম্পর্ক না থাকলেও আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ঠিকই রাজনীতি চলে। আমরা হিজড়ারা মূলত গুরুমা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। দারাজনী গুরুমার প্রধান হলেও আমাদের পরিবারে তাঁর কোন প্রভাব নাই। গুরুমা কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট এলাকার টাকা-পয়সা উঠানোর দায়িত্বে থাকে 'মালকিন'। মালকিন যখন সবাইকে নিয়ে মহল্লায় বের হন তখন আমরা যাঁরা থাকি তাঁরা সবাই 'চ্যালা'। চ্যালাদের মালকিন ও গুরুমা উভয়ের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে হয়। কখনো কখনো আমাদের গুরুমা তাঁর খুব কাছের একজন চ্যালাকে নির্দিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে মালকিন বানিয়ে ঐ এলাকায় বসবাস করার সুযোগ দেন। এ দায়িত্ব পাওয়ার জন্য আমরা সব চ্যালারাই গুরুভক্তিতে মেতে উঠি।

ডায়াগ্রাম-১: হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো।

দারাজনীর যোগ্যতা, ক্ষমতা ও দায়িত্ব

দারাজনী হলেন হিজড়াদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্তর, যিনি গুরুমাদের গুরুমা হিসেবে পরিচিত। তাঁকে সম্রাজ্ঞী হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। দারাজনীকে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হয়। দারাজনীকে ছিন্নি হিজড়া জনগোষ্ঠীর উপভাগের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়, কারণ হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 'ছিন্নি শ্রেনী' উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। দারাজনী মূলত তাঁর অধীনস্থ গুরুমাদেরকে বিভিন্ন এলাকার দায়িত্ব প্রদান করেন। অধীনস্থ গুরুমারা সর্বদাই দারাজনীকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রথা অনুযায়ী দারাজনীর নূন্যতম যোগ্যতা হচ্ছে: ৫৫ বছর বয়স উর্ধ্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হয়; তাঁর অধীনে কমপক্ষে ৫-১০ জন দীক্ষিত গুরুমা থাকতে হয় এবং সর্বোপরি গুরুমা হিসেবে কোন এলাকার দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। দারাজনীর কর্তৃত্ব সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বিচার-সালিশের ক্ষেত্রে সার্বিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা একমাত্র দারাজনীর। দারাজনী সকল সদস্যের মতামত, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তিনি সাধারণত পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেন না। তাই দারাজনীর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অধীনস্থ সকল গুরুমা ও চ্যালারা মেনে নেন। তবে একজন দারাজনীর কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যেমন- তাঁর অধীনস্থ গুরুমাদের মধ্যে বড় ধরনের দ্বন্দ্ব, সংঘাত কিংবা কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে বুদ্ধিমত্তা ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে তা সমাধান করা এবং গুরুমাদের বিপদে-আপদে সহযোগিতা প্রদান করা।

গুরুমায়ের যোগ্যতা ও দায়িত্ব

গুরুমা সাধারণত উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। দারাজনীর ন্যায় তাঁরাও ছিন্নি শ্রেণীভুক্ত। শিষ্যরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে থাকেন। গুরুমা হিজড়া সম্প্রদায়ের সকল ধরনের বিচার-সালিশে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। একজন গুরুমা সাধারণত নানা যোগ্যতার অধিকারী, যেমন- অত্যন্ত সাহসী ও বাগ্মী; কর্ম দক্ষতাসম্পন্ন; পরোপকারী ও শক্তিশালী নেতৃত্বের অধিকারী; নেতৃত্বদানে প্রাজ্ঞ এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী। উল্লেখিত নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন গুরুমা নিজ নিজ দলকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁর নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে, যেমন- দলে নবাগত হিজড়াদের অভিভাবকত্ব নির্ধারণ করা; হিজড়াদের আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠান শেখানো; দলের সবার প্রাথমিক ব্যয়ভার বহন করা; সবাইকে সন্তানতুল্য মেনে সবার কল্যাণে কাজ করা; শিষ্যদের গোপনীয় শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যগত বিষয়ের দেখভাল করা এবং নিজেদের মধ্যে কোন ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব হলে তা নিরসন করা। এ বিষয়ে বিউটি (৩৭) বলেন,

> আমাদের গুরুমার অনেক দায়িত্ব। আমরা হিজড়ারা তো দেশের সাধারণ নাগরিকের মত না। বাস্তবে গুরুমা-ই আমাদের অভিভাবক, তিনিই আমাদের মা-বাবা দু'টোই। গুরুমা আমাদের ভাল চান এবং আমাদের ভালোর জন্য কাজ করেন। আবার আমরা একত্রে থাকতে গিয়ে যখন ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়ি তখন গুরুমা তা সমাধান করে দেন। যদি গুরুমা না থাকতেন, তাহলে আমরা চলতে পারতাম না।

গুরুমা ও চ্যালার সম্পর্ক

হিজড়াদের প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুমা ও চ্যালার মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে হিজড়াদের দলে আগত নতুন সদস্যকে 'চ্যালা' বলা হয়। একজন নতুন সদস্য হিজড়া

দলে কোন না কোন চ্যালার মাধ্যমে আসার পর ঐ নবাগত হিজড়া দলের যে কাউকে গুরুমা বা অভিভাবক বানাতে পারে। এক্ষেত্রে সেই নবাগত হিজড়া চাইলে কয়েকদিন সময় নিতে পারেন কিংবা প্রথম দিনেই গুরুমা নির্বাচন করতে পারেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁকে হিজড়া সমাজের রীতি-নীতি ও প্রথা শেখানো হয়। তবে এ নবাগত হিজড়ার অভিভাবক সবাই হতে পারে না কেননা তাঁর সার্বিক দায়িত্ব নেয়ার জন্য অভিজ্ঞতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সকলের থাকে না। এই নবাগত হিজড়া বা চ্যালা যাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন তিনিই হবেন তাঁর 'গুরুমা' এবং নবাগত ঐ হিজড়া হবেন সংশ্লিষ্ট গুরুমার 'শিষ্য'। তাই প্রথম দিন থেকে সেই গুরুমা'ই তাঁর প্রাথমিক খরচ বহন করেন (Hossen, 2019)। বৃহত্তর বাঙালি পরিবারে যেমন সন্তানদের নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা থাকে তেমনি কাউকে চ্যালা হিসেবে গ্রহণ করার পূর্বেও গুরুমায়ের কিছু পরিকল্পনা থাকে। চ্যালার সকল ধরনের কাজকর্মের ভুল বা অপরাধের জবাবদিহিতা অভিভাবক হিসেবে গুরুমার উপর ন্যস্ত থাকে। থাকা ও খাওয়াসহ সব কিছুর দায়িত্ব নিতে হয় গুরুমাকে (Safa, 2016)। গুরুমা-ই চ্যালাদের প্রথাগত রাজনৈতিক অভিভাবক। এ সম্পর্কে Reddy বলেন,

> The guru-cela relationship is the most important bond among hijras and is necessarily central to hijra conceptions of family. It is a mutually beneficial, reciprocal relationship, entainling both social and economic obligations and responsibilities for both parties (2005:156).

অর্থাৎ নবাগত হিজড়া বা চ্যালার সকল দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করবেন তিনিই প্রথাগত রাজনৈতিক অভিভাবক কিংবা পিতা-মাতার ভূমিকা পালন করবেন। পিতা-মাতা সমতুল্য এ সকল হিজড়া সদস্যদের চ্যালারা 'গুরুমা' বলে সম্বোধন করেন। তাঁরাই (গুরুমা) মূলত চ্যালার দেখাশুনা করে থাকেন (Hossen, 2019)। এছাড়াও হিজড়াদের দলে বিদ্যমান মুরুব্বী কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ কিন্তু গুরুমা নন এমন হিজড়াকেও চ্যালারা 'গুরুমা' ডাকতে পারেন। হিজড়া সমাজে গুরুমা ও চ্যালার মধ্যকার এই সম্পর্ক 'Milk Daughter' বা 'দুধ বেটি' হিসেবেও স্বীকৃত (Hossain, 2021)। শরীর ম্যাসাজ, মাথা টিপে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা এবং মনের গোপন কথা আদান-প্রদানের সম্পর্ক গুরুমার সাথে হয়ে থাকে। গুরুমা তাঁর যাবতীয় সেবা, দেখাশুনা ও গোপন পরামর্শ ইত্যাদি তাঁর প্রিয় শিষ্যের থেকেই গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই সাধারণত পরবর্তী গুরুমা ঠিক করে যান। তাই দলের প্রায় সকলেই গুরুমা'র মন খুশি করার চেষ্টা করেন। তবে গুরুমা ও চ্যালার মধ্যকার সম্পর্ক, শ্রদ্ধা ও ভক্তি কিছু নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে থাকে (Habib, 2012)। গুরুমা-ই যেহেতু সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক তাই তিনি শিষ্যদেরকে নিজ পরিবার ও সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করেন (Hossain, 2021; Reddy, 2005)। চ্যালাদের মূল দায়িত্ব হলো গুরুমায়ের কথামত চলা, নিয়ম পালন করা এবং যথাসম্ভব সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের খুশি রাখা (Hossain, 2021; Hossen, 2019)। যেহেতু একজন গুরুমা তাঁর অধীনস্থ সকল চ্যালাদের খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা ও পেশা তথা জীবন-জীবিকার সকল বিষয়ের যোগান, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তাই চ্যালারা মূলত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুমায়ের উপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে Reddy বলেন,

> Celas are expected to be obedient, respectful, and loyal, and to serve their gurus well by catering to all their domestic needs. In exchange for their celas' services and earnings, gurus are required to look after their health and well-being, treat them fairly, provide them clothes and food, and give them the necessary training and knowledge about hijra customs and manners to permit their rise in seniority. The relationship between a gurus and her cela is often hightly idealized, with the guru being the cela's "mother, father, husband, sister, everything (2005:157).

তবে নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চ্যালারা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হন। অর্থাৎ চ্যালারা গুরুমা কর্তৃক শোষিত হয়ে থাকেন। অবশ্য শোষিত হলেও চ্যালাদের মধ্যে খুব বড় কোনো আক্ষেপ থাকে না। এ বিষয়ে শান্তনা (২৫) বলেন,

> আমরা গতকাল ৫৩০০ টাকা আদায় করেছিলাম। ৩০০ টাকা যাতায়াত ও নাস্তা বাবদ আমাদের খরচ হয়েছিল। এ আদায়কৃত ৫০০০ টাকার মধ্য থেকে ২০০০ টাকা গুরুমার। বাকী ৩০০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা মালকিনের। আমরা চার চ্যালা ৫০০ টাকা করে ভাগে পেলাম। আমরা যদি গুরুমা বা মালকিন হতে পারি আমরাও বেশি টাকা পাবো। এখন নিয়ম অনুযায়ী গুরুমাকে তার ভাগের অংশ না দিয়ে উপায় নেই।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা: অন্তর্দ্বন্দ্ব, সালিশ ও সমাধান

আধুনিক রাষ্ট্রের যেমন আইন ও বিচার ব্যবস্থা রয়েছে হিজড়াদেরও তেমন আইন-শৃংখলা রক্ষা, দ্বন্দ্ব নিরসন ও সংহতি বজায় রাখার জন্য অলিখিত বা অনানুষ্ঠানিক রীতি-নীতি রয়েছে। অর্থাৎ হিজড়া সমাজের রীতিনীতি ও ঐতিহ্য অনুসারে যেকোন বিশৃঙ্খলার সমাধান করা হয়। চুরি, মিথ্যা বলা, অগ্রহণযোগ্য অঙ্গভঙ্গি, চাঁদা আদায়ের এলাকা নির্ধারণ, বাজার থেকে মালামাল উঠানো, বাসায় পারিক (প্রেমিক) আসলে হাসাহাসি, উপার্জিত টাকার ভাগাভাগি, গুরুমা ও মালকিনের পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে হিজড়াদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়। অনেক সময় চ্যালারা উপার্জিত অর্থের পরিমান গোপন করেন যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এছাড়াও চ্যালার সাথে চ্যালা, মালকিনের সাথে চ্যালা অথবা গুরুমার সাথে চ্যালাদেরও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। সাধারণত চ্যালার সাথে চ্যালার দ্বন্দ্ব হলে গুরুমা অথবা মালকিন তা সমাধান করেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরিমানা করলেও তা উভয় পক্ষই মেনে নেন। বিশৃংখলার ধরন ও পর্যায়ের উপর ভিত্তি করে জরিমানার পরিমাণ ২৫০০ থেকে ৫১০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। তবে মালকিনের সাথে শিষ্যের সমস্যা হলে কেবল গুরুমাকেই বিচার করতে হয়। বিচারে যদি শিষ্যের দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁকে জরিমানা দিয়ে অন্য মালকিনের কাছে হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করেন গুরুমা। যদি গুরুমা ও শিষ্যের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দেয় তাহলে জরিমানা ও ক্ষমার মাধ্যমে শিষ্যকে অন্য এলাকায় প্রেরণ করা হয়। তবে তা দ্বন্দ্বের ধরনের উপর নির্ভর করে। দ্বন্দ্ব যদি সাধারণ প্রকৃতির হয় তাহলে গুরুমা-ই সমাধান করেন। কিন্তু গুরুমা, মালকিন ও চ্যালার মধ্যকার দ্বন্দ্ব যদি জটিল প্রকৃতির হয় তাহলে এই দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য গুরুমা তাঁর উর্দ্ধতন দারাজনীকে আহবান করেন। দারাজনীর রায় বিবাদমান গুরুমা, মালকিন ও চ্যালা সবাই মানতে বাধ্য থাকেন। আবার দ্বন্দ্ব যদি এলাকা ভিত্তিক হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের মধ্যকার এ

ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য রয়েছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা হিজড়াদের প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র। হিজড়াদের মধ্যে বড় দ্বন্দ্ব বা সমস্যাসমূহ মূলত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সমাধান হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দুই হিজড়া গোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ও সমস্যা নিরসনের জন্য দারাজনী সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল গুরুমাকে আমন্ত্রণ করেন। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে আয়োজিত সভা সন্ধ্যার পর শুরু হয় এবং সমাধানে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। যে গ্রামে বা মহল্লায় এ সভা আয়োজন করা হয় সেখানকার গুরুমা সে সভার সভাপতিত্ব করেন (মজুমদার ও বসু, ১৯৯৭)। কলির (৩৫) ভাষ্যমতে,

> আমাদের এখানে গুরুমা অনেক ক্ষমতার অধিকারী। আমরা হিজড়ারা চ্যালা থেকে উপরে অবস্থান করতে পারবো ততবেশী আমাদের মর্যাদা এবং ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাবে। এজন্য আমাদেরকে চ্যালা থেকে শুরু করে গুরুমা অবধি সকল হিজড়াদের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখতে হয় যেন পরবর্তীতে আমরাও গুরুমা হতে পারি। মাঝে মধ্যে আমাদের হিজড়াদের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘটনা ঘটে থাকে। একসাথে থাকার কারণে ঝামেলা হয়। জটিল কোনো দ্বন্দ্ব হলে তা বৃহৎ পরিসরে পঞ্চায়েত সভার মাধ্যমে সমাধান করা হয়।

'হিজড়া লিঙ্গের' স্বীকৃতি ও প্রভাব

বর্তমান সরকার হিজড়া জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা জোরদার করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে এই জনগোষ্ঠীকে 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় (Khanam, 2021)। অতঃপর ২০১৪ সালের ২৬ জানুয়ারি 'হিজড়া লিঙ্গের' স্বীকৃতির রাষ্ট্রীয় গেজেট প্রকাশ করা হয় এবং তা আইন আকারে পাস করা হয়। সরকারের এই স্বীকৃতি হিজড়াদের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং অবারিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। ফলে পূর্বে হিজড়া জনগোষ্ঠী প্রথাগত রাজনৈতিক ধারায় আবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তাঁরা প্রথাগত রাজনৈতিক ধারা পরিবর্তন করে বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হয়ে উঠছেন। হিজড়া জনগোষ্ঠী ভোটাধিকারসহ অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার লাভের কারণে বৃহত্তর রাজনৈতিক ধারায় প্রবেশ করছেন। এ প্রসঙ্গে সোমা (৪১) বলেন,

> পূর্বে বৃহত্তর সমাজে আমাদের কোন মর্যাদা ছিল না। আমরা গুরুমার অধীনে কাজ করতাম এবং যা আয় হত তা দিয়ে গুরুমা ও নিজেদের কিছু ব্যক্তিগত খরচ মিটাতাম। অনেক সময় গুরুমারা আমাদের সাথে রাজনীতি করতেন। আমাদের অর্জিত টাকা দিয়ে গুরুমা নিজের সম্পদ বানাতেন। আমরা তখন গুরুমা-চ্যালা এই সম্পর্কের বাইরে আর কিছুই জানতাম না। গুরুমা যা বলতেন বা বুঝাতেন তা-ই ছিল আমাদের ধ্যান ও জ্ঞান। কিন্তু বর্তমানে আমাদের মাঝে ধীরে ধীরে সচেতনতা বাড়ছে। হিজড়া লিঙ্গের স্বীকৃতি হওয়ার কারণে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। আস্তে আস্তে আমরাও রাজনীতিতে যুক্ত হতে পারছি।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের ধরন

প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চ্যালারা বিভিন্ন ভাবে বৈষম্যের শিকার হন। তারা গুরুমা কর্তৃক শোষিত হয়ে থাকেন এবং বিভিন্নভাবে গুরুমায়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও মূল ধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রাপ্তির ফলে তাদের সেই নির্ভরশীলতা কমেছে। পাশাপাশি বৈষম্য ও শোষণ থেকেও তারা কিছুটা মুক্ত হচ্ছে। এমনকি গুরুমাও চ্যালাদের কিছুটা সমীহ করে

চলেন। ফলে গুরুমা-চ্যালার সম্পর্কের বাইরে গিয়ে শিষ্যরা নতুনভাবে জীবনযাপন করতে পারছেন। তাছাড়া হিজড়াদের প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যায়, শোষণ ও বৈষম্য কমেছে। তারা চাইলে বৃহত্তর রাজনীতিতে আসতে পারে, বৃহত্তর সমাজের সাথে চলতে পারে। তাছাড়া শিক্ষা, চাকরিসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মত তারাও অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও পাচ্ছে। উপরন্তু বর্তমান সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে এবং আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবার থেকে বিচ্যুত হিজড়াদের গৃহ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে তারা প্রথাগত সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছেড়ে বৃহত্তর সমাজ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

ভোটাধিকার ও স্বাধীনতা

হিজড়া জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতির কারণে ভোটার তালিকা নিবন্ধন ফরম (ফরম-২) এর ক্রমিক নম্বর ১৭ পরিবর্তন ও সংশোধন করে লিঙ্গ নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'পুরুষ' ও 'নারী' এর পাশাপাশি 'হিজড়া লিঙ্গ' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টসহ সকল ক্ষেত্রে হিজড়াদের নিজস্ব পরিচিতি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে (মোরশেদ, ২০২১)। বর্তমানে হিজড়ারা জাতীয় নির্বাচনসহ সকল রাজনৈতিক নির্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকার লাভ করেছে। এ ভোটাধিকার লাভের ফলে হিজড়া জনগোষ্ঠী এখন বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার অর্জন করেছেন। হিজড়াদের নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা না থাকায় তাঁরা সাধারণত তাঁদের বর্তমান বসবাসরত এলাকায় নিবন্ধন ও ভোটার তালিকাভুক্ত হন। গবেষিত এলাকায় দেখা যায়, অনেক হিজড়া এখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেন। ফলে তাঁরা সেখানকার ভোটার হয়েছেন। এখন তাঁরা তাঁদের ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন (Daize & Masnun, 2019)। তবে তাঁরা প্রকাশ্যে সাধারণত গুরুমার পছন্দমত দলকে সমর্থন প্রদান করলেও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজেদের ইচ্ছামত দল বা প্রার্থীকে ভোট প্রদান করে থাকেন। আবার হিজড়াদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ঐক্য থাকায় তাঁরা অনেক সময় গুরুমার নির্দেশিত প্রার্থীকেই ভোট প্রদান করেন এবং সেই প্রার্থীকে জয়লাভ করতে সহায়তা করেন। তবে তা অবশ্য শিষ্যদের নিকট সেই গুরুমার গ্রহণযোগ্যতা বা জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে। শিষ্যদের নিকট গুরুমার গ্রহণযোগ্যতা ভালো হলে তাঁরা গুরুমার নির্দেশিত প্রার্থীকেই ভোট প্রদান করেন। Daize ও Masnun (2019) তাঁদের গবেষণায় উল্লেখ করেন যে, তথ্যদাতাদের মধ্য থেকে ২২ শতাংশ হিজড়া নির্বাচনে তাঁদের ইচ্ছামত পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদান করেন এবং ৬২ শতাংশ হিজড়া চাপের মুখে তাঁদের গুরুমার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদান করে থাকেন। অবশিষ্ট ১৬ শতাংশ হিজড়া রাজনৈতিক নেতা বা অন্যান্যদের চাপের মুখে তাদের নির্ধারিত পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদান করতে বাধ্য থাকেন। জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে হিজড়ারা রাজনৈতিক মিছিল, মিটিং, পোস্টার লাগানোসহ নানা ধরনের নির্বাচনী কাজ করে থাকেন। এ বিষয়ে শালিক (৩২) নামে একজন গুরুভক্ত শিষ্য বলেন,

> গুরুমার অধীনে আমরা সাতজন শিষ্য থাকি। আমরা আমাদের গুরুমার নির্দেশে একজন প্রার্থীর জন্য অনেকের সাথে মিছিল করেছি এবং ঐ প্রার্থীর পোস্টার বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়েছি। আমাদের গুরুমা যা আদেশ করে আমরা তা-ই করি, তার বাইরে কিছুই করি না। কারণ তিনি আমাদের অভিভাবক। তিনি যা করতে বলেন আমরা তা-ই করি। তিনি আমাদেরকে খুবই ভালোবাসেন। আমরা তাঁর কথায় ভোট দিয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতেও দিবো।

তবে ভিন্ন মতামতও পাওয়া যায়। যেমন- এ বিষয়ে শ্যামা সুন্দরী (৩২) বলেন,

> আগে থেকেই আমার এক প্রার্থী পছন্দ ছিল। কিন্তু গুরুমা আমাকে অন্য একজন প্রার্থীকে ভোট দিতে বলেছিলেন। কিন্তু ভোট দেয়ার সময় আমি আমার পছন্দের প্রার্থীকেই ভোট দিয়েছি। কারণ তাঁকে আমার পছন্দ, তাঁকে আমার ভালো লাগে। আমাকে কেউ কখনও চাপ দিয়ে ভোট আদায় করতে পারবে না।

বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও হিজড়া জনগোষ্ঠী

অতীতে হিজড়ারা প্রথাগত রাজনৈতিক ধারায় আবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তাঁরা বিভিন্ন কারণে বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন। পূর্বে হিজড়ারা বাংলাদেশের মূলধারার রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত হতে পারতেন না এবং হিজড়ারা নিজেরা রাজনৈতিক দলের হয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করতেন না। এমনকি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের হয়ে রাজনৈতিক কোন কর্মসূচিতেও কখনো অংশগ্রহণ করতেন না। কিন্তু হিজড়া লিঙ্গের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের পর তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হতে শুরু করেছেন। ভোটাধিকার লাভের কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিভিন্ন পদস্থ ও নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সখ্য সম্পর্ক তৈরির সুযোগ পাচ্ছেন। ভোটাধিকার এবং স্থানীয় রাজনীতিতে হিজড়াদের অবদান ও প্রভাব থাকায় স্থানীয় নেতারাও গুরুমার সাথে সম্পর্ক রাখেন। কেননা হিজড়া সদস্যরা মূলত সংঘবদ্ধ এবং অনেকাংশে গুরুমা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। আবার রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সখ্য সম্পর্ক থাকার কারণে তাঁরা তাঁদের পেশাগত সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। যেমন- কিছু শিষ্য চাঁদা আদায় করতে গিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েন। তখন তা সমাধান করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমর্থনের প্রয়োজন হয়। বিধায় গুরুমারা তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। এ বিষয়ে শ্যামা (৫৯) নামক এক গুরুমা বলেন,

> আমরা রাজনীতি না করলেও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকে। গুরুমা হিসেবে আমি সবার সাথে যোগাযোগ রাখি। কারণ শিষ্যরা বাইরে গেলে অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। ঝগড়া বড় হলে আমাদেরই তো মিটাতে হবে। আমরাই তো শিষ্যদের অভিভাবক। এজন্য নিজেদের প্রয়োজনে না হলেও শিষ্যদের প্রয়োজনে স্থানীয় নেতাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়। এছাড়াও এটি সীমান্তবর্তী এলাকা। শিষ্যরা কে কখন কোন পথে যায় ঠিক নেই। অপরাধমূলক কর্মকন্ডে ফলে আমরা গুরুমারা প্রশাসনের সাথেও সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উদার রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে হিজড়ারা এখন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগও লাভ করছেন। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের ত্রিলোচনপুর ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নজরুল ইসলাম ওরফে ঋতু নামক একজন হিজড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার কারণে দ্বিগুণ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন (প্রথম আলো, ২০২১)। এছাড়াও ২০১৯ সালে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সাদিয়া আক্তার পিংকি (৩৭) নামে একজন হিজড়া। তিনি লেখাপড়া করেছেন দশম শ্রেণি পর্যন্ত। তাঁকে তাঁর পরিবার বিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু টেকেনি সেই সংসার। সংসার ভাঙার পর এক সময় কোটচাঁদপুরে পোশাকের দোকান পরিচালনা করলেও পরবর্তীতে তিনি

রাজনীতি ও সমাজসেবায় মনোনিবেশ করেন। নির্বাচিত হওয়ার অনেক আগেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। পাশাপাশি স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন (দৈনিক মানবজমিন, ২০১৯)। হিজড়াদের স্বীকৃতির ফলে তাঁদের সরকারি কিংবা বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ২০১৪ সাল থেকে জারিকৃত বিভিন্ন চাকরির বিজ্ঞাপনে 'হিজড়া লিঙ্গের' স্বীকৃতি প্রাপ্ত হিজড়াদের হিজড়া লিঙ্গ বা পরিচয়ে আবেদন করার সুযোগ প্রদান করেছে (রনি, ২০১৮)। এ ছাড়াও তাসনুভা আনান শিশির নামক একজন হিজড়া বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংবাদ পাঠিকার চাকরি লাভ করেছেন (বিবিসি বাংলা, ২০২১)। বলা যায়, হিজড়াদের 'হিজড়া লিঙ্গের' স্বীকৃতির ফলে তাদের জীবনপ্রবাহে ইতিবাচকভাবে পরিবতিন এসেছে। ভোটের রাজনীতির মাঠেও তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারই অংশস্বরূপ সরকার দেশের কিছু এলাকায় হিজড়াদেরকে জমিসহ পাঁকা ঘর প্রদান করেছে, সেখানে তাঁরা হাসি-আনন্দে সময় অতিবাহিত করছেন (জসিম, ২০২১)। পাশাপাশি তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তাঁরা গরু-ছাগল পালন, শাক-সবজি চাষাবাদ এবং সেলাই মেশিনে কাজের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন (জসিম, ২০২১)। সর্বোপরি হিজড়াদের 'হিজড়া লিঙ্গের' স্বীকৃতির ফলে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পথ সুগম হয়েছে। ভোটাধিকার, ভোটার তালিকা সংশোধন, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টসহ ক্রমেই তাঁরা তাঁদের সকল রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পথে অগ্রগামী হচ্ছেন। ভোটের রাজনীতিতে হিজড়াদের রাজনৈতিক অধিকার সূচিত হওয়ার কারণে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল রাজনৈতিক দলের নিকট হিজড়াদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে চলেছে। হিজড়ারা ক্রমেই রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠছেন। এ বিষয়ে শিউলি (৩২) বলেন,

> আগে তো আমাদের কোন ধরনের অধিকারই ছিল না। এখন তো সরকার আমাদেরকে হিজড়া লিঙ্গের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এখন রাজনীতিতে আমাদের ভোটাধিকার রয়েছে। আমরা এখন জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারি। ফলে আমরা আমাদের বিভিন্ন অধিকার আদায় করে নিতে পারছি।

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যখন বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করছে তখন এদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হয়ে অসহায় জীবন যাপন করছেন (হুসাইন, ২০০৫)। হিজড়ারা বাধ্য হয়ে পরিবার বা সমাজ থেকে আলাদা হয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা গঠন করে বসবাস করেন (মুখার্জী, ১৯৯৫)। তাঁদের এই স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থায় প্রথাগত বা গোষ্ঠীগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান। হিজড়া জনগোষ্ঠীর এই প্রথাগত রাজনৈতিক ধারা দারাজনী, গুরুমা, মালকিন ও শিষ্য এ চার স্তরে আবর্তিত হয়। এ রাজনৈতিক স্তরে দারাজনী সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকলেও গুরুমায়ের উপর মালকিন ও চ্যালার সকল বিষয় ন্যস্ত থাকে। গুরুমা-ই হিজড়াদের অভিভাবক ও পরমাত্মীয়। দারাজনী ও গুরুমা তাঁদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে হিজড়াদের মধ্যকার সকল অন্তর্দ্বন্দ্ব, সালিশ ও সমস্যা সমাধান করেন। যেহেতু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দিয়েই সমাজ ও রাষ্ট্র সূচারুরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে, তাই বর্তমানে হিজড়ারা তাঁদের নাগরিক জীবনের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য ক্রমেই রাজনীতিপ্রবণ হয়ে উঠছেন। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক হিজড়া লিঙ্গের স্বীকৃতি কিছুটা হলেও তাঁদের রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন

সাধন করেছে। ভোটাধিকার, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্টসহ বেশকিছু অধিকার লাভ করেছেন। ভোটাধিকার লাভ করায় হিজড়াদের ভোটের রাজনীতির মাঠে গুরুত্ব ও সমাদর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তাঁরা রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সখ্য সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে নিজেদের পেশাগত সুবিধা আদায় করে থাকেন। হিজড়ারা তাঁদের পেশাকে টিকিয়ে রাখতে বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। বর্তমানে তারা সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত হচ্ছেন। এমনকি নিজেরাই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েও জয়লাভ করছেন। সরকার ও সাধারণ মানুষও তাঁদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রসারিত করেছে। বর্তমান সরকার হিজড়াদের আবাসন ব্যবস্থাসহ আরো বেশকিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদানে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তৎপর। হিজড়াদের হিজড়া লিঙ্গের স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে সামাজিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে তাঁদেরকে এগিয়ে নিয়েছে। আর রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের কারণে নাগরিক ও সামাজিক অধিকার আদায় করা সম্ভব হচ্ছে। সরকার হিজড়াদেরকে তাঁদের পিতা-মাতার সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ইতিবাচকভাবে চিন্তা করছেন। এই অধিকার অর্জিত হলে হিজড়াদের অনেক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। কেননা পিতা-মাতার সম্পত্তিতে তাঁদের অধিকার সূচিত হলে তাঁরা সামাজিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন এবং অর্থনৈতিকভাবে অন্যের সাহায্য প্রার্থী হবেন না। তাই পিতা-মাতার সম্পত্তিতে তাঁদের অধিকার সূচিত হলে অবহেলিত ও অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীকে মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা অনেকাংশে সম্ভব হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বর্তমান গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থায়নে পরিচালিত ও চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সংশোধিত প্রবন্ধ।

তথ্যপঞ্জী

জসিম, সালাহ উদ্দিন, (০৩/০২/২০২১). 'অচ্ছুত' জীবনে আশ্রয়ণের আলো। জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম। [অনলাইন]।

দৈনিক মানব জমিন (১৭/১০/২০১৯). তৃতীয় লিঙ্গের প্রথম মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি। https://mzamin.com/article.php?mzamin=194873.

প্রথম আলো. (২৮/১১/২০২১)। নৌকার প্রার্থীকে হারিয়ে হিজড়া নজরুলের চমক। [অনলাইন]।

বিবিসি বাংলা নিউজ. (৭-ই মার্চ, ২০২১)। ট্রান্সজেন্ডার সংবাদ পাঠক তাসনুভার বদলে যাওয়ার গল্প।

মোরশেদ, গোলাম (২৫/০২/২০২১)। বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনা। [অনলাইন] https://www.banglatribune.com/668615.

মুখার্জী, সুব্রত (১৯৯৫). হিজড়া; কেন নাহি দিবে অধিকার. দিদিভাই, বাঁকুড়া (জৈষ্ঠ্য ১৪০২)।

মজুমদার, নীহাররঞ্জন (২০০৭). *হিজড়ে সমাজ-মানবিক অনুসন্ধান*. কলকাতা : সাহিত্য প্রকাশ।

মজুমদার, অজয় ও বসু, নিলয় (১৯৯৭). ভারতের হিজড়ে সমাজ. কলকাতা: দীপ প্রকাশন।

হুসাইন, এস. এ. এম. (২০০৫). তৃতীয় প্রকৃতি বাংলাদেশের হিজড়াদের আর্থ-সামাজিক চিত্র. ঢাকা: ষড়ঋতু।

রনি, আমানুর রহমান. (২০১৮). হিজড়াদের 'তৃতীয় লিঙ্গ'র স্বীকৃতি আছে, অধিকার নেই। বাংলা ট্রিবিউন। https://www.banglatribune.com/national/320641/হিজড়াদের-'তৃতীয়-লিঙ্গ'-স্বীকৃতির-পর-আরও-বেড়েছে

Daize, A.S. & Masnun, E. (2019). Exploring the Socio-economic and Cultural Status of Third Gender Comminity in Bangladesh. *Jagannath University Journal of Arts*. 9(2). pp. 181-192.

Ember, C. R & Ember, M. (1993). *Anthropology*. USA: Prentice-Hall, Inc.

Fried, M. H. (1967*). The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology*. New York: McGraw Hill

Habib, T. (2012). A Long Journey towards for Hizra Population in Bangladesh. University of Gothenburg, International Master's Programme in Social Work and Human Rights, Degree Report 30, Higher Education Credits, Autumn 2012.

Haviland, W.A. (1990). *Cultural Anthropology*. USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Hassan, M. E. (2020). Political inclusion of Hijra (Transgender) in Bangladesh: An Overview. *International Journal of Humanities and Social Science*. https://www.researchgate.net/publication/340609783_Political_inclusion_of_Hijra_Transgender_in_Bangladesh_An_Overview.

Hossain, A. (2021). *Beyond Emasculation: Pleasure and Power in the Making of Hijra in Bangladesh.* New York: Cambridge University press.

Hossen, M. L. (2019). Challenges of Right to Employment Faced by Transgender Hijra in Bangladesh. M. A. Thesis, Mahidol University. https://asiapacific.gchumanrights.org/wp-content/uploads/2020/07/Liton-Hossen-thesis.pdf.

Khanam, A. (2021). Human Rights of Hijras in Bangladesh: An Analysis. *Social Science Review* [The Dhaka University Studies, Part-D], 38 (1). pp. 249-276. DOI: https://doi.org/10.3329/ssr.v38i1.56533.

Kottak, C. P. (2015). *Cultural Anthropology*. USA: McGraw Hill Education.

Mal, S. (2018). The Hijras of India: A Marginal Community with Paradox Sexual Identity. Available at <http://www.indjsp.org > [Accessed on February 5, 2019] IP: 47.11.230.98.

Nanda, S. (1999). *Neither Man nor Woman: The Hizra of India*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

Reddy, G. (2005). *With Respect to Sex: Negotiating Hijra Identity in South India***.** Chicago, IL: University of Chicago Press.

Safa, N. (2016). Inclusion of excluded: Integrating need Based concerns of Hijra population in mainstream development. *Sociology and Anthropology,* 4(6): 450-458. DOI: 10.13189/sa.2016.040603.

Service, E. R. (1962). *Primitive Social Organizqation: An Evolutionary Perspective*. New York: McGraw Hill.

Sharma, P. (2012). Historical Background and Legal Status of Third Gender in Indian Society. *International Journal of Research in Economics & Social Sciences,* 2 (12): 64-71.